بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ মোতাবেক ২৫ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

পরিখার যুদ্ধে বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গের কারণে এই যুদ্ধের পর তাদের দুর্গ অবরোধের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, যেন মুসলমানদের ক্ষতিসাধন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়। এর বিশদ বিবরণ হলো, অবরোধ যখন তীব্র রূপ ধারণ করে তখন মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনু কুরায়যা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। বনু কুরায়যার অবরোধ কতদিন পর্যন্ত ছিল– এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দশ দিনের উল্লেখ আছে, কোনোটিতে পনেরো দিন, কতক বর্ণনায় চৌদ্দো দিন আবার কোনোটিতে পঁচিশ দিনও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত পর্যালোচনা করে বর্ণনা করেছেন যে, এই অবরোধের মেয়াদকাল ছিল কমবেশি প্রায় বিশ দিন।

এই মীমাংসার জন্য হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে বিচারক মনোনীত করা হয়। এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) ইহুদীদের বন্দি করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। এই কাজের তত্ত্বাবধান করেন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)। নারী ও শিশুদেরকে দুর্গ থেকে বাহিরে এনে এক পাশে রাখা হয়। আর এদের ওপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। আর যা কিছু তাদের দুর্গের ভেতরে ছিল যেমন, অস্ত্রশস্ত্র, জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি জড়ো করা হয়। তারা সেখানে ১৫শ তরবারি, ৩শ বর্ম, ২ হাজার বর্শা, ১৫শ চামড়ার ঢাল এবং অনেক জিনিসপত্র পান। অনেক তৈজসপত্র, মদ, মটকা এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য পান যেগুলো ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়। এছাড়া অনেক উট এবং অন্যান্য পশুও পাওয়া যায়, যেগুলো সব জড়ো করা হয়। অওস গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমাদের মিত্ররা অনুতপ্ত ও উদ্‌বিগ্ন। তাই আমাদের খাতিরে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। মহানবী (সা.) নীরবে বসে থাকেন। অওস গোত্রের লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকে আর এক পর্যায়ে গোত্রের সবাই চলে আসে এবং অনুনয় বিনয় করতে থাকে; তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাদের বিষয়ে মীমাংসার দায়িত্ব তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের ওপর অর্পণ করা হলে তোমরা কি এতে সম্মত হবে? সবাই বলেন, (অবশ্যই) কেন নয়! তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব সা'দ বিন মুআযের প্রতি অর্পণ করা হলো।

অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, মীমাংসার জন্য আমার সাহাবীদের মধ্য হতে যাকে চাও বেছে নাও। তখন তারা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে বেছে নেন (আর) মহানবী (সা.)-ও এতে সম্মত হন। হযরত সা'দ (রা.) অওস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং বনু কুরায়যার মিত্র ছিলেন। এতে অওস গোত্রের লোকেরা শুধুমাত্র আশ্বস্তই হয় নি বরং আনন্দিত হয়ে যায়; কেননা তাদের ধারণা ছিল, এখন বিষয়টি আমাদের অনুকূলে চলে এসেছে। মিত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা আরবের রীতি ছিল, কিন্তু

(এক্ষেত্রে) ঐশী নিয়তি ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং হযরত সা'দ (রা.)-র পবিত্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় সকল আত্মীয়তা ও সম্পর্কের ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কেই প্রাধান্য দিয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) সে সময় মদীনার মসজিদে **রাফিদা আসলামিয়ার** তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আহতদের সেবাযত্ন করতেন আর মসজিদের ভেতরেই তার একটি তাঁবু ছিল। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে সেই তাঁবুতে রেখেছিলেন যেন (তার) চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করা যায় আর সহজে তার সাথে দেখাসাক্ষাৎও করা সম্ভব হয়। মহানবী (সা.) যখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র হাতে বিষয়টি অর্পণ করেন তখন অওস গোত্রের সদস্যরা তার কাছে যায় এবং তাকে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করায়, যার জিন ছিল খেজুর গাছের ছালের এবং জিনের ওপর চামড়ার গদি পাতা ছিল। এর লাগামও খেজুর গাছের আঁস দিয়ে বোনা হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) স্থূলকায় যুবক ছিলেন। লোকেরা হযরত সা'দ (রা.)-র চারপাশে সমবেত হয়ে বলতে আরম্ভ করে, হে আবু আমর! মহানবী (সা.) অওস গোত্রের মিত্রদের বিষয়টি আপনার ওপর ন্যস্ত করেছেন যেন আপনি তাদের সাথে সদাচরণ করেন। আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইতঃমধ্যে আরও অনেক মানুষ সমবেত হয়, কিন্তু হযরত সা'দ (রা.) নীরব থাকেন। লোকেদের পীড়াপীড়ি যখন বেড়ে যায় তখন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে, আমি আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোনো তিরস্কারকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন আর মানুষজনও তাঁর (সা.) নিকটে উপবিষ্ট ছিল। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) যখন সেই মসজিদের নিকটে আসেন যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন– যেটি বনু কুরায়যার অবরোধের সময় নামায পড়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল– তাকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। আরেক রেওয়ায়েত মতে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হও। বনু আব্দে আশহালের লোকেরা বলে, আমরা হযরত সা'দ (রা.)-র জন্য দুটি কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে থাকে, যতক্ষণ না তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, হে সা'দ! তাদের মাঝে মীমাংসা করো। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.) মীমাংসা করার বেশি অধিকার রাখেন। মহানবী (সা.) বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; (কিন্তু) আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি তাদের বিষয়ে মীমাংসা করো। অওস গোত্রের লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, হে আবু আমর! মহানবী (সা.) আপনার মিত্রদের (বিষয়ে) মীমাংসা করার (দায়িত্ব) আপনার ওপর ন্যস্ত করেছেন। তাই আপনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং তাদের দুর্দশাকে আপনার সামনে রাখুন। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তোমরা কি বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তে মেনে নেবে? তারা বলে, হ্যাঁ, মানবো। আমরা আপনার মীমাংসার বিষয়ে তখন থেকেই সম্মত যখন আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ আপনার অনুপস্থিতিতেও আমরা আপনার নাম প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের পক্ষ থেকে আপনি স্বাধীন। আমরা প্রত্যাশা রাখি, আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন; যেভাবে আপনি ছাড়াও অন্য কেউ তাদের মিত্র বনু কায়নুকার প্রতি করেছিল। আমরা আপনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি এবং আজকের দিনে আমরা আপনার মীমাংসার একান্ত মুখাপেক্ষী। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এরপর তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনার এ কথার অর্থ কী যে, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি! আমার সিদ্ধান্তই

কি কার্যকর হবে? (কথা) পাকাপোক্ত করার জন্য দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, (অবশ্যই)। এরপর হযরত সা'দ (রা.) সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যেদিকে মহানবী (সা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের কারণে তাঁকে সম্বোধন না করে বলেন, আর এদিকে উপবিষ্ট লোকেরাও কি একই অঙ্গীকার করছেন? (অর্থাৎ) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেন। মহানবী (সা.) এবং (তাঁর পাশে বসা) লোকেরাও বলেন, জি হ্যাঁ। এরপর হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করছি যে, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক। আর (তাদের) ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হোক এবং ঘরবাড়ি মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক, আনসারদের নয়। আনসাররা বলে, আমরা তাদের ভাই। তাদের সাথেই ছিলাম। তিনি বলেন, আমি চাই তোমাদের ওপর তাদের নির্ভরশীলতার যেন অবসান ঘটে, অর্থাৎ মুহাজিরগণ যেন কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে সা'দ! তোমার এই রায় আল্লাহ্ তা'লার সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা সপ্তম আকাশে করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই ফেরেশতারা আমাকে সেহ্‌রীর সময় অবহিত করেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন যে,

অবশেষে প্রায় বিশ দিনের অবরোধের পর এই দুর্ভাগা ইহুদীরা এমন একজন ব্যক্তিকে তাদের বিচারক হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে সম্মত হয় যিনি তাদের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে নিজ হৃদয়ে তাদের প্রতি কোনো দয়া অনুভব করছিলেন না। তিনি যদিও ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, কিন্তু তার হৃদয়ে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন-এর ন্যায় ভালোবাসা ও দয়া থাকা সম্ভব ছিল না। সংক্ষিপ্তাকারে এর বিবরণ হলো, অওস গোত্র বনু কুরায়যার পুরোনো মিত্র ছিল আর সেই যুগে এই গোত্রের নেতা ছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি পরিখার যুদ্ধে আহত হয়ে তখন মসজিদ প্রাঙ্গনে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

হযরত সা'দ বাহনে আরোহণ করে আসছিলেন। পথিমধ্যে অওস গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি তার কাছে জোর দিয়ে বারংবার এই আবেদন করে, বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র; যেভাবে খাযরাজ গোত্র তাদের মিত্র বনু কায়নুকার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করেছিল আপনিও বনু কুরায়যার প্রতি নমনীয় আচরণ করুন আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন না। সা'দ বিন মুআয প্রথমে নীরবে তাদের কথা শুনছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যখন অত্যধিক জোর দেওয়া হয় তখন হযরত সা'দ বলেন, এটি এমন এক সময় যখন সা'দ সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরোয়া করবে না। এই উত্তর শুনে লোকেরা নীরব হয়ে যায়।

হযরত সা'দ যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন **'কূমূ ইলা সাইয়্যিদিকুম'** অর্থাৎ তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও এবং বাহন থেকে অবতরণে তাকে সাহায্য করো। যখন সা'দ (রা.) বাহন থেকে নেমে মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হন তখন তিনি (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, হে সা'দ! বনু কুরায়যা তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করেছে আর তুমি তাদের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে– তারা তা মেনে নেবে। এ কথা শুনে হযরত সা'দ নিজ গোত্র অওস-এর লোকদের লক্ষ্য করে

বললেন, عليكم بذالک عهدالله و ميثاقه ان الحكم فيهم بما حكمت অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে এই দৃঢ় অঙ্গীকার করছো যে, তোমরা সর্বাবস্থায় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে যা আমি বনু কুরায়যা সম্পর্কে প্রদান করব? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করছি। এরপর সা'দ মহানবী (সা.) যেদিকে উপবিষ্ট ছিলেন সেদিকে ইশারা করে বলেন, و على من ههنا অর্থাৎ আর যে সত্তা এখানে উপবিষ্ট রয়েছেন তিনিও কি এই অঙ্গীকার করছেন যে, তিনিও সর্বাবস্থায় আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবেন? তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি অঙ্গীকার করছি।

এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর সা'দ (রা.) তার সিদ্ধান্ত শোনান যা এরূপ ছিল: বনু কুরায়যার যোদ্ধাদের অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও সন্তানদেরকে বন্দি করা হোক। তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হোক। মহানবী (সা.) যখন এই সিদ্ধান্ত শুনেন তখন অবলীলায় বলে উঠেন,لقد حكمت بحكم الله অর্থাৎ তোমার এই সিদ্ধান্ত একটি ঐশী নিয়তি, যা অটল। তাঁর এই কথার অর্থ ছিল, বনু কুরায়যা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত এমন পরিস্থিতিতে হয়েছে যাতে পরিষ্কারভাবে ঐশী হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় আর এ কারণে তাঁর (সা.) দয়া এটিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। আর প্রকৃত অর্থেই একথা সঠিক ছিল। কেননা বনু কুরায়যার পরামর্শের জন্য হযরত আবু লুবাবাকে আহবান জানানো আর হযরত আবু লুবাবার মুখ দিয়ে এমন একটি কথা বেরিয়ে যাওয়া যা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ছিল; পক্ষান্তরে বনু কুরায়যার মহানবী (সা.)-কে বিচারক হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানানো, অপরদিকে অওস গোত্রের লোকেরা আমাদের মিত্র, তাই তারা আমাদের ছাড় দেবে–এই ধারণা করে অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে তাদের বিচারক নির্ধারণ করা, আর এরপর সত্য ও ন্যায়ের পথে হযরত সা'দ (রা.)-র এমন সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়া যার ফলে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির অনুভূতি মন থেকে সম্পূর্ণ লোপ পায়, আর পরিশেষে সা'দ (রা.)-র নিজ রায় ঘোষণার প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-এর নিকট হতে এ মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করা যে, সর্বাবস্থায় এই সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে– এই সমস্ত বিষয় কাকতালীয় হতে পারে না। আর নিঃসন্দেহে এর নেপথ্যে ঐশী তকদীর কাজ করছিল। এই সিদ্ধান্ত ছিল খোদা তা'লার, সা'দ (রা.)-র নয়।

সা'দ বিন মুআয (রা.)-র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে আরো লেখা আছে, হযরত সা'দ যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন তখন মহানবী (সা.) ৯ যিলহজ্জ রোজ বৃহস্পতিবার মদীনায় ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) ৫ যিলহজ্জ তারিখে ফিরে আসেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন, মহানবী (সা.) ৭ যিলহজ্জ তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন এবং দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেই যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে তিনি (সা.) আদেশ দেন যে, তাদেরকে যেন মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। নারী ও শিশুদের হযরত রামলা বিনতে হারেস (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তাদের সকলকেই হযরত রামলা বিনতে হারেস (রা.)-র বাড়িতে বন্দি করা হয় এবং মহানবী (সা.) তাদের জন্য খেজুর নিয়ে আসার নির্দেশ দিলে সমস্ত খেজুর মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লোকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেজুর নিয়ে আসে এবং ইহুদীরা রাতভর পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করে। মহানবী (সা.)

অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও পোশাক ইত্যাদি হযরত রামলা (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন আর উট ও ছাগলের পাল সেখানেই বৃক্ষের নীচে চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন,

সম্ভবত বনু কুরায়যা গোত্রের অঙ্গীকারভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ, অরাজকতা ও নৈরাজ্য এবং হত্যা ও রক্তপাতের কারণে ঐশী আদালত থেকে এই রায় আসে যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। যেমন প্রথমত মহানবী (সা.)-এর এই যুদ্ধ সম্পর্কে খোদার পক্ষ থেকে আহুত হওয়া থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি ঐশী তকদীর ছিল; কিন্তু খোদা তা'লা এটি চান নি যে, তাঁর রসূলের মাধ্যমে এই রায় প্রকাশিত হবে। তাই তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অদৃশ্য হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছেন আর সা'দ বিন মুআয (রা.)-র মাধ্যমে এই রায় ঘোষণা করান। আর রায়টিও এমনভাবে (ঘোষণা) করিয়েছেন যে, তখন মহানবী (সা.) মোটেও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না; কেননা তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন যা সা'দ বিন মুআয করবেন। তাঁর (সা.) প্রতি অমুসলিমরা ও আপত্তিকারীরা আর কখনো কখনো আমাদের যুবসমাজকেও মানুষ এটি বলে বিষিয়ে তোলে যে, বনু কুরায়যার প্রতি তিনি (সা.) অন্যায় করেছেন। এই আপত্তির স্পষ্ট উত্তর হলো, তিনি (সা.) তো রায় দেন নি! এছাড়া রায়ও আল্লাহ্ তা'লা তাদের মিত্র দ্বারাই করিয়েছেন এবং তিনিও তাঁর (সা.) নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রভাব কেবল মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরং সমস্ত মুসলমানদের ওপর পড়তো তাই তিনি (সা.) নিজ রায় দ্বারা, তা যতই ক্ষমা ও দয়ার ভিত্তিতে হোক না কেন– এই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার অধিকার আছে বলে মনে করতেন না। এটিই সেই ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল যার ক্ষমতা ও শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তাঁর (সা.) মুখ থেকে স্বভাবতই এই শব্দাবলি নিঃসৃত হয়েছে যে, **ক্বাদ হাকামতা বিহুকমিল্লাহ্।** অর্থাৎ, হে সা'দ! তোমার এই রায় তো ঐশী তকদীর বলে মনে হচ্ছে, যা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। একথা বলে তিনি (সা.) নীরবতার সাথে সেখান থেকে উঠেন এবং শহরের দিকে চলে আসেন। তখন তাঁর (সা.) মন এই ধারণায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল যে, একটি জাতি যাদের ঈমান আনার বিষয়ে তাঁর (সা.) হৃদয়ে প্রবল বাসনা ছিল, নিজেদের অপকর্মের কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে গেল এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তির কোপানলে নিপতিত হচ্ছে। সম্ভবত এ পরিস্থিতিতে তিনি (সা.) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন, لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ، لَآمَنَتْ بِي اليَهُودُ অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্য থেকে যদি দশজন ব্যক্তি তথা দশ-বারোজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও ঈমান আনত তবে আমি খোদার কাছে আশা রাখতাম যে, এই পুরো জাতি আমাকে মেনে নিত এবং ঐশী কোপানল থেকে বেঁচে যেত। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি (সা.) নির্দেশ দিলেন, বনু কুরায়যার পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরকে পৃথক করে দেওয়া হোক। অতঃপর উভয় শ্রেণিকে পৃথক করে মদীনায় নিয়ে আসা হয় এবং শহরে দুটি পৃথক স্থানে একত্রিত করা হয় আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে সাহাবীরা বনু কুরায়যার খাবারের জন্য ফলের স্তূপ করে দেন, যেখানে কি-না তাদের মাঝে অনেকেই হয়ত ক্ষুধার্ত থাকবেন। আর লেখা আছে, ইহুদীরা রাতভর ফল আহারে মগ্ন ছিল।

সকাল হতেই মদীনার একটি বাজারে গর্ত খোদাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা আবু জাহাম আদভীর ঘর থেকে নিয়ে আজারুয যায়েদ পর্যন্ত খোদাই করা হয়। অতঃপর মহানবী

(সা.) আসেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য সাহাবীরাও ছিলেন। তিনি (সা.) বনু কুরায়যার পুরুষদেরকে ডাকেন। তাদেরকে ছোটো ছোটো দল আকারে আনা হতো এবং এই গর্তে ফেলে হত্যা করা হতো। তাদেরকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা কা'ব বিন আসাদকে বলে, তোমার অভিমত কী? মুহাম্মদ (সা.) কী করতে যাচ্ছে? সে বলে, যা তোমাদের খারাপ লাগবে তা-ই করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ যা তোমাদের ভালো লাগবে না। তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কোনো অবস্থাতেই বুঝতে চাও না। যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে সে তো কাউকে ছাড়ছে না, আর যে ব্যক্তি যাচ্ছে সে তো আর ফেরত আসছে না। আল্লাহ্‌র কসম! তার জন্য তরবারিই রয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তোমাদের বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি তোমাদেরকে অন্য কথার দিকে ডেকেছিলাম কিন্তু তোমরা অস্বীকার করেছ। ইহুদীরা বলল, এটি রাগের সময় নয়। আমরা যদি তোমার মতামত মেনে নিতাম তাহলে আমরা কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আমাদের মধ্যকার বিদ্যমান অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণ হতাম না? হুয়ী বিন আখতাব বলে, এখন এসব কথা বাদ দাও। এখন তোমাদের কোনো অপরাধ ক্ষমা করা হবে না। এখন কেবল তরবারির জন্য অপেক্ষা করো। হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে ইহুদীদের হত্যার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে, কিছু বন্দিকে হত্যার জন্য বিভিন্ন সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করা হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণে লেখেন,

পরের দিন সকালে সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবার ছিল। মহানবী (সা.) কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) নিজেও নিকটবর্তী একটি স্থানে বসে ছিলেন যেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় যদি এমন কোনো বিষয় সামনে আসে যাতে তাঁর দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন। এছাড়া কোনো অপরাধীর পক্ষ থেকে যদি অনুগ্রহের আবেদন করা হয় তিনি যেন অনতিবিলম্বে রায় দিতে পারেন। যদিও সা'দের বিষয়টি তাঁর (সা.) সামনে আদালতের আইন অনুযায়ী উপস্থাপন হতে পারত না, কিন্তু একজন বাদশা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি (সা.) যে–কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই প্রাণভিক্ষার আবেদন অবশ্যই শুনতে পারতেন। তিনি অনুগ্রহের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে এ নির্দেশও দেন যে, অপরাধীদের যেন একজন একজন করে পৃথকভাবে হত্যা করা হয়, অর্থাৎ একজনের হত্যার সময় যেন অন্য কেউ সামনে না থাকে। সুতরাং একজন একজন করে অপরাধী আনা হয় এবং সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হত্যা করা হয়।

বনু নযীরের প্রধান হুয়ী বিন আখতাব এসে মহানবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার বিরোধিতা করা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই? কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, যে খোদাকে পরিত্যাগ করে খোদাও তাকে পরিত্যাগ করেন। এরপর লোকদের সম্বোধন করে বলতে লাগল, খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কারো কিছু করার সাধ্য নাই। এটি তাঁরই নির্দেশ এবং তাঁরই তকদীর।

অনুরূপভাবে কা'ব বিন আসাদকে যখন হত্যা করা হয়; বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসাদকে যখন হত্যার জন্য বধ্যভূমিতে আনা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে ইঙ্গিতে মুসলমান হবার আহ্বান জানান। সে বলে, হে আবুল কাসেম! আমি তো মুসলমান হয়ে যেতাম; কিন্তু মানুষজন বলবে, সে মৃত্যুকে ভয় পেয়েছে। সুতরাং আমাকে ইহুদী অবস্থায় মরতে দাও।

এক ইহুদী রিফাআ-র ক্ষমা সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, রিফাআ নামক আরেক ইহুদী এক দয়ালু মুসলমান নারীকে অনুনয়বিনয় করে তাকে নিজের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয় এবং মহানবী (সা.) সেই মুসলমান নারীর সুপারিশে রিফাআকেও ক্ষমা করে দেন। মোটকথা সেদিন যে ব্যক্তির সুপারিশ তাঁর কাছে উপস্থাপিত হয়েছে তিনি (সা.) তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা একথার প্রমাণ যে, তিনি সা'দের সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে অপারগ ছিলেন, নতুবা তিনি কস্মিনকালেও তাদেরকে হত্যা করার বাসনা রাখতেন না।

এটি উক্ত অভিযোগের অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি জবাব যে, তিনি যুলুম করেছেন। এভাবেই ঘটনা ঘটতে থাকে, অর্থাৎ বনু কুরায়যার পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়। এই দায়িত্ব পালন সমাপনান্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান থেকে চলে গেলেন আর গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে থাকে। এরপর গর্তগুলোকে মাটি দ্বারা ভরাট করা হয়। এ সবকিছু হযরত সা'দ বিন মুআযের চোখের সামনে ঘটেছে। আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তার হৃদয় প্রশান্ত হয়।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুসারে নারীদের মাঝে কেবল নুবাতাকে হত্যা করা হয়েছিল যে বনু কুরায়যার এক ব্যক্তি হাকামের স্ত্রী ছিল। সে জনৈক মুসলমান সাহাবী হযরত খাল্লাদকে বনু কুরায়যার দুর্গের দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকা অবস্থায় ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু জীবনীকারক এ রেওয়ায়েতের সাথে একমত পোষণ করেন নি। তাদের দৃষ্টিতে বনু নযীর অথবা খায়বারের কতিপয় রেওয়ায়েত এ ঘটনার সাথে গুলিয়ে যাবার ফলে এবং অন্য কিছু সামঞ্জস্যের কারণে এই নারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনা সঠিক নয়। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

রেহানা বিনতে যায়েদ নাযরিয়ার ঘটনাও রয়েছে। বনু কুরায়যার বন্দি মহিলা ও শিশুদেরকে মদীনার মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাদের মাঝে বনু নযীরের এক নারী রেহানা বিনতে যায়েদ ছিল, বনু কুরায়যার হাকাম নামক এক ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন। অনেকের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কারো কারো মতে তিনি (সা.) তাকে দাসী হিসেবে রেখেছিলেন আর কারো কারো মতে বিয়ে করেছিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে, কোনটি ভুল বা কোনটি সঠিক– তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায়। গবেষণা করলে বুঝা যায়, জীবনীকারকরা এতে ভুল করেছেন। প্রথম কথা হলো, এ রেওয়ায়েত প্রকৃত ঘটনার বিপরীত এবং বানোয়াট। আর যদি এতে কিছুটা সত্য থেকেও থাকে তাহলে কেবল এতটুকু যে, মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন আর সে তার মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আর এ রেওয়ায়েতটি সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা হলেও আসল কথা হলো, নবী করীম (সা.) তাকে বিয়ে করেছিলেন, দাসী হিসেবে রাখেন নি। যেমন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'রেহানা' সংক্রান্ত বিষয়ে লেখেন,

কতিপয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন, বনু কুরায়যার বন্দিদের মাঝে রেহানা নামের এক নারী ছিল যাকে মহানবী (সা.) দাসী হিসেবে নিজের কাছে রেখেছিলেন। আর এই রেওয়াতের ভিত্তিতে স্যার উইলিয়াম মুইর এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণ করেছে। কিন্তু সত্য কথা হলো, এই রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। প্রথমত, সহীহ বুখারীর উপরোক্ত রেওয়ায়েত এই রেওয়ায়েতকে ভুল সাব্যস্ত করে যাতে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু কুরায়যার বন্দিদেরকে সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

যদি মহানবী (সা.) কোনো নারী বন্দিকে নিজের গৃহের জন্য পৃথক করে রাখতেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুখারীর রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু বুখারীতে এর ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এছাড়াও অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়, রেহানা সেসব বন্দিদের একজন ছিল যাদেরকে মহানবী (সা.) অনুগ্রহবশত মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর রেহানা মদীনা থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পিত্রালয়ে তথা বনু নযীরে চলে যায়, আর সেখানেই অবস্থান করে। আল্লামা ইবনে হাজার যিনি ইসলামের শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের মাঝে একজন, এই রেওয়ায়েতকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যদি এটি স্বীকারও করে নেওয়া হয় যে, রেহানাকে মহানবী (সা.) নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন, তবুও নিঃসন্দেহে সে তাঁর (সা.) স্ত্রী ছিল, দাসী নয়। যেসব ইতিহাসবিদ রেহানার সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন, তাদের মাঝেও অধিকাংশ এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, তিনি (সা.) তাকে স্বাধীন করে তাকে বিবাহ করেছেন। ইবনে সা'দ একটি রেওয়ায়েত স্বয়ং রেহানার ভাষায় বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং এরপর আমি মুসলমান হয়ে যাবার পর আমাকে বিবাহ করেছিলেন। আর আমার মোহরানা বারো আওকিয়া বা চল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ হয়েছিল। ইবনে সা'দ এই রেওয়ায়েতের বিপরীতে সেই রেওয়ায়েত যেটির ওপর স্যার উইলিয়াম মুইর ভিত্তি রেখেছেন, স্পষ্টতই ভুল এবং সত্যপরিপন্থি আখ্যা দিয়েছেন। যাহোক, এটি সন্দেহযুক্ত রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে রয়েছে। লেখা হয়েছে, এটিই জ্ঞানীদের গবেষণা।

মোটকথা, প্রথমত বুখারীর রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় এবং আসাবাতে স্পষ্ট করা হয়েছে, মহানবী (সা.) রেহানাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেন নি, বরং তাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন, যার পর সে নিজের গোত্রে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। দ্বিতীয়ত যদি এই রেওয়ায়েতকে সঠিকও আখ্যা দেওয়া হয় যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন– তবুও মহানবী (সা.) তাকে স্বাধীন করে তাকে বিবাহ করেছিলেন, তাকে দাসী হিসেবে রাখেন নি, যেমনটি তার একটি রেওয়ায়েত থেকে কয়েকজন লিখেছেন। সেটি কতটুকু সত্য আল্লাহ্ ভালো জানেন।

এছাড়া একথাও স্মরণ রাখতে হবে, রেহানার নাম এবং তার বংশ পরিচয় ও গোত্র সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহে এত মতবিরোধ রয়েছে যে, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাও অযৌক্তিক হবে না; বিশেষত যখন এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা হয় যে, তাকে এমন এক ব্যক্তির স্ত্রী বলা হচ্ছে যিনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার বিষয়ে বিস্তারিত লেখা রয়েছে, যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) খেজুর ভাগ করে বণ্টন করেন। এই যুদ্ধে ছত্রিশটি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ নির্ধারিত ছিল। অশ্বারোহীর জন্য এক অংশ এবং পদাতিকের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করা হয়। এক হাজার নারী ও শিশু বন্দি ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে এর এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে নেন। বন্দিদের পাঁচভাগ করেন আর সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ রেখে দেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে (কতককে) স্বাধীন করে দেন আর (কতককে) হেবা করে দেন এবং (কতককে) সেবক হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনিভাবে খেজুর থেকেও এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করেন এবং প্রত্যেক জিনিসের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে (বাকি) অংশ বণ্টন করে দেওয়া হয়। সেগুলোর প্রত্যেক অংশের জন্য লটারি করা হতো। খুমুসের জন্য যে অংশ লটারিতে উঠতো, সেটি তিনি (সা.)

গ্রহণ করতেন আর মাহমিয়া বিন জাযা যুবায়দীকে খুমুসের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এরপর বাকী চারভাগ (সবার মাঝে) বণ্টন করেন। মহানবী (সা.) সে–সকল মহিলাদেরকেও অংশ প্রদান করেন যারা যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। সে–সকল মহিলাদের মাঝে হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত উম্মে আম্মারা, হযরত উম্মে সালিত, হযরত উম্মে আলাআ আনসারীয়া, হযরত সুমায়রা বিনতে কায়স, হযরত উম্মে সা'দ বিন মুআয এবং হযরত কাবসা বিনতে রাফে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাকে একটি দলের সাথে খুমুসের সম্পদ অর্থাৎ কয়েদি ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন যেন এর বিনিময়ে যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে আসেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উসমান বিন আফ্ফান এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ সেগুলোর মাঝ থেকে একাংশ ক্রয় করে নেন কিন্তু অপর এক ভাষ্যমতে, ঐ সকল বন্দিকে মদীনাতেই রাখা হয়, অন্য কোথাও প্রেরণ করা হয় নি। এরপর ধীরে ধীরে মহানবী (সা.) তাদেরকে অনুগ্রহস্বরূপ মুক্তি দিতে থাকেন।

এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.) গবেষণা করেছেন। তিনি (রা.) লেখেন:

শিশু ও নারীরা যাদেরকে হযরত সা'দ (রা.)-র সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্দি করা হয়েছিল, তাদের বিষয়ে কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) তাদেরকে নাজদে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে কতিপয় নাজদী গোত্র তাদেরকে মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়িয়ে নিয়েছিল আর সেই অর্থ দিয়ে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করেছিলেন। এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ নাজদী গোত্রগুলো এবং বনু কুরায়যা পরস্পর মিত্র ছিল আর বনু কুরায়যার যুদ্ধের কেবল কয়েকদিন পূর্বেই তারা আহযাবের যুদ্ধে মুসলামনদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যুদ্ধ করেছিল আর মূলত নাজদবাসীদের উসকানিতে বনু কুরায়যা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাই নাজদবাসীরা যদি তাদের মিত্র গোত্র বনু কুরায়যার বন্দিদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এসকল বন্দি মদীনাতেই ছিল; তারা অন্য কোথাও যায় নি আর মহানবী (সা.) তাদেরকে রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আবার সেই বন্দিদের অনেকে নিজেদের মুক্তিপণ প্রদান করে স্বাধীন হয়ে যায়। আর কতিপয়কে মহানবী (সা.) এমনিই অনুগ্রহ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এরা ধীরে ধীরে নিজেরাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে যায়। যেমন তাদের মাঝে আতিয়া কুরেযী ও আব্দুর রহমান বিন যুবায়ের বিন বাতিয়া আর কা'ব বিন সুলায়েম এবং মুহাম্মদ বিন কা'বের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। এরা সকলে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মাঝে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন কা'ব, তিনি এক মহান মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে গত হয়েছেন।

অতএব এ সকল বন্দি মহিলাদেরকে বণ্টন করা হোক বা তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হোক– এ সময় মহানবী (সা.) এমন একটি আদেশ দিয়েছিলেন যা তাঁর দয়ার ব্যাপকতা এবং তিনি যে নারীজাতির পরিত্রাতা ছিলেন– তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। মহানবী (সা.) বলেন, যে বন্দি মহিলাকেই বণ্টন করা হোক বা বিক্রয় করা হোক না কেন, তার সাথে যদি ছোটো ছেলে বা মেয়ে থাকে তাহলে সেই শিশুসন্তানকে যেন সাবালক হবার আগ পর্যন্ত তার মা থেকে পৃথক করা না হয়। ঠিক তেমনি যদি ছোটো দুবোন থেকে থাকে তাহলে সাবালক হবার আগ পর্যন্ত তাদেরকেও যেন পৃথক করা না হয়। এটি ছিল 'রহমতুল্লিল আলামীন'

(সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এবং নারীদের প্রতি মহানুভবতা আর বন্দিদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এবং নিজ বিরোধীদের প্রতি মহানুভবতা। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখুন! তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে মানুষকে ঘরছাড়া করছে, বের করে দিচ্ছে, হত্যা করছে আর এর পরিণতি যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো, মুসলমানদের নিজেদের সম্মান পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল মুসলমানকে বিবেকবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)